কারণ, আমি ঘুমাতে পারি না

কারণ আমি ঘুমাতে পারি না ২

কারণ আমি ঘুমাতে পারি না ৩

কারণ আমি ঘুমাতে পারি না ৪

কারণ আমি ঘুমাতে পারি না ৫

কারণ আমি ঘুমাতে পারি না ৬

কারণ আমি ঘুমাতে পারি না ৭

কারণ আমি ঘুমাতে পারি না ৮

কারণ আমি ঘুমাতে পারি না ৯

কারণ আমি ঘুমাতে পারি না ১০

কারণ আমি ঘুমাতে পারি না ১১

কারণ আমি ঘুমাতে পারি না ১২

কারণ আমি ঘুমাতে পারি না ১৩

কারণ, আমি ঘুমাতে পারি না
জালালুদ্দীন রুমির প্রেমের কবিতা

অনুবাদ : আনোয়ার হোসেইন মঞ্জু

অনলাইনে অর্ডার করতে
http://nalonda.com.bd
কলকাতায় পরিবেশক
বইবাংলা
স্টল ১৭, ব্লক ২, সূর্য সেন স্ট্রিট
কলেজ স্কোয়ার দক্ষিণ, কলকাতা ৭০০০১২
ফোন : +৯১৭৯০৮০৭১৭৬৫ (কলকাতা)

কারণ, আমি ঘুমাতে পারি না	জালালুদ্দীন রুমী
অনুবাদ	আনোয়ার হোসেইন মঞ্জু
প্রকাশক	রেদওয়ানুর রহমান জুয়েল নালন্দা ৩৮/৪ বাংলাবাজার (মান্নান মার্কেট) ৩য় তলা ঢাকা-১১০০
প্রচ্ছদ	সজল চৌধুরী
প্রথম প্রকাশ	ফেব্রুয়ারি ২০২৪
মুদ্রণ	নালন্দা প্রিন্টার্স
বর্ণবিন্যাস	নালন্দা কম্পিউটার বিভাগ
মূল্য	৪৫০.০০ টাকা মাত্র
যুক্তরাষ্ট্র পরিবেশক	মুক্তধারা জ্যাকসন হাইটস নিউ ইয়র্ক

©	Translator
Karon Ami Ghumate Pari na	Jalaluddin Rumi
Translated by	Anwar Hossain Manju
Publisher	Redwanur Rahman Jewel Nalonda 38/4 Banglabazar (Mannan Market) 2nd Floor Dhaka-1100
Cover Design	Sazal Chowdhury
First Published	February 2024
Printers	Nalonda Printers
Compose & Make-up	Nalonda Computer Department
Price	450.00 Taka Only
ISBN	978-984-97773-2-8
E-mail	nalonda71@gmail.com

উৎসর্গ

আমার দুই সহপাঠি সুখী দম্পতি
মাকসুদা লিরা ও মোশতাক মেহেদী

সূচিপত্র

ভূমিকা ৯
প্রেমের পানে তাকাও ৩৯
আল্লাহ’র মহিমা ৬৩
কারণ, আমি ঘুমোতে পারি না ৬৯
হৃদয়ের সৌন্দর্য্য ৭১
বুদ্ধিজীবী প্রদর্শনে বিশ্বাসী ৭২
প্রেম হলো জীবনের পানি ৭৩
আমার দরজায় কে? ৭৪
গীতি কবিতা ৭৬
চতুর্পদী ৭৭
একশো ধরনের ইবাদত ৭৮
সুখের এক মুহূর্ত ৭৯
আল্লাহর বাণীর মানবিক রূপ ৮০
ধৈর্য্য ধারণ করো ৮১
আমি শুদ্ধতার পানিতে গলে যাই ৮২
জীবনের যেকোনো সময় ৮৩
ভালোবাসার জন্য ৮৪
যে আত্মা অমৃত পান করে ৮৫
যন্ত্রণায় কাতর না হলে ৮৬
একটি মোমবাতি ৮৭
আর কতকাল ৮৮
অসীমতার প্রেম ৮৯
আমি নিজের গভীরতা দেখি ৯০
শেষ পর্যন্ত ৯১
নিঃসঙ্গতা ৯২
তোমার আত্মায় জীবনের শক্তি ৯৩

৯৪ আমার মুখে কে কথা বলে?
৯৫ ছায়া এবং আলোর উৎস
৯৬ ভোরের স্বাদ
৯৭ দুই ধরনের জ্ঞান
৯৮ আমরা সত্তা বন্টন করি
৯৯ বীজ কেনা-বেচার বাজার
১০০ অতিথিশালা
১০১ দুই বন্ধু
১০২ আমি বিলম্ব করেছি
১০৩ যদি দৃশ্যমান কিছু পেতে চাও
১০৪ এখন আমাদের যা আছে
১০৫ একটি পথ আছে
১০৬ ভোরের মৃদুমন্দ বায়ু
১০৭ পাখির গান
১০৮ এখানে নয়
১০৯ সন্ধ্যার সাথে কোনো কৌশল নয়
১১০ হালকা বাতাস
১১১ শুধু সেই নিঃশ্বাস
১১২ বহমান পানি
১১৩ ধারণা ছাড়িয়ে
১১৪ আত্মার সম্প্রদায়
১১৫ কে এই পরিবর্তন করে
১১৬ দেহের নিদ্রাই আত্মার জাগরণ
১১৭ প্রেমের বিবরণ
১১৯ ভূমিকা
১২২ তোমার জন্য আমার মুখে আগুন

ওখানে কী মধুরতা লুকানো আছে ১২৩
বেহেশতের ছাদ নামিয়ে আনো ১২৪
আমি কী তোমাকে বলিনি ১২৬
ঝরণার পানির সোরাহি ১২৭
সুরুয়ার মাঝে আল্লাহ্ ১২৮
জামা খুলে ফেলা ১২৯
উড্ডয়নের পথে ১৩০
পর্বত শীর্ষে গর্ত ১৩১
খোলা জনালা ১৩২
উত্তরের বাতাস ১৩৩
প্রবেশ পথ ১৩৪
উন্মোচনকারী ১৩৫
একটি মুখের নীরব উচ্চারণ ১৩৭
প্রেমিকরা জেগে ওঠো ১৩৯
লাইলি এবং খলিফা ১৪১
উত্তমরূপে তৈরি রুটি ১৪২
মানুষ সুখি হতে চায় ১৪৩
বিরাট এক বাহন ১৪৪
তোমার মুখ খুঁজছি ১৪৮
আকাঙ্ক্ষা ১৫০
আমার প্রিয়তমা ১৫১
জাগ্রত আবেগ ১৫২
প্রেমের পথ ১৫৩
তোমার মাঝে আমার সৌন্দর্য ১৫৪
ঠিক এমন ১৫৫
প্রেমিক-প্রেমিকা ১৫৭
মান ও সালওয়া ১৫৮
এই মুহূর্তের মূল্য দাও ১৫৯

১৬০ প্রতি মুহূর্তে আমি প্রতিমা গড়ি
১৬১ আল্লাহর মানুষ
১৬২পানি হলো ‘জিকর’
১৬৩ আল্লাহ তোমাকে ভালোবাসেন
১৬৬ ক্লান্তিতে দীর্ঘশ্বাস ফেলো না
১৬৭ আমাকে ছাড়া যেও না
১৬৮ আমাকে অনুভব করতে চাই
১৬৯ আমাকে খুঁজে পেয়েছো
১৭১ এসো পরস্পরকে ভালোবাসি
১৭২ যখন আমি নিদ্রিত
১৭৩ আমি যদি কাঁদি
১৭৪ আনন্দের সাথে খোঁজো
১৭৫ তোমাকে ছেড়ে যেতে পারি না
১৭৬ আমার মা সৌভাগ্য, বাবা উদারতা
১৭৭ জিহ্বা দিয়ে বিভ্রান্ত করব
১৭৯ সৃষ্টির প্রতি চোখ বন্ধ রাখি
১৮০ শত্রুর বিদ্রূপ হৃদয়ে শুনি
১৮২ কে আমার হৃদয়ের ঘরে
১৯৩ ঘোড়ার আরোহী
১৮৪ আরও তারকা আছে
১৮৫ প্রেমের আগুনে দহন
১৮৬ সূর্য কূপের মাঝে অস্ত যায়
১৮৭ অনন্ত প্রেম
১৮৮ আল্লাহ আমার হৃদয়ে
১৮৯ ভালোর জন্য যাওয়া
১৯০ আমি আমার বুকে দোলা খাই
১৯১ প্রেম ছুরি হাতে এগিয়ে আসে
১৯২ গভির ভাবে শোনা

ভূমিকা

জালালুদ্দীন রুমি ১২০৭ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর বর্তমান আফগানিস্তানের বলখ নগরীর কাছে ইসলামি আইনবিদ, ধর্মতত্ত্ববিদ ও সুফিবাদী দীর্ঘ ঐতিহ্যের অধিকারী এক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ওই এলাকা তখন পারস্য সাম্রাজ্যের পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত ছিল। রুমি যখন সবে কিশোর বয়সী, ঠিক তখন পশ্চিম দিকে আড্রিয়াটিক সাগর পর্যন্ত সাম্রাজ্য বিস্তারকারী চেঙ্গিস খানের অগ্রবর্তী বাহিনীর অভিযানের ঠিক আগে তাঁর পরিবার বলখ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। বলা হয়ে থাকে যে রুমির পিতা বাহাউদ্দীন নব্বইটি উটের পিঠে তার বই চাপিয়ে যাত্রা শুরু করেছিলেন। রুমি ও তাঁর পরিবার প্রথমে দামেশক এবং সেখান থেকে যান নিশাপুরে, যেখানে খ্যাতনামা কবি ও ওস্তাদ ফরিদউদ্দীন আত্তার কিশোর রুমিকে ভবিষ্যৎ মহান ব্যক্তিত্ব হিসেবে চিনতে পারেন। এমন কথাও প্রচলিত আছে যে, রুমির পিতা বাহাউদ্দীনকে ফরিদুদ্দীন আত্তার তাঁর দিকে আসতে দেখেন এবং তাঁর কিছু পেছনে ছিলেন রুমি। তিনি বলে উঠেন, "একটি সমুদ্রের আগমণ ঘটছে, সে সমুদ্রকে অনুসরণ করে আসছে একটি মহাসমুদ্র।" এই অন্তর্দৃষ্টির সম্মানে তিনি রুমিকে তাঁর গ্রন্থ 'ইলাহিনামা'র (আল্লাহর গ্রন্থ) একটি কপি উপহার দেন।

শেষ পর্যন্ত রুমির পরিবার বর্তমান তুরস্কের দক্ষিণ-মধ্য এলাকায় অবস্থিত কোনিয়ায় স্থায়ীভাবে বসতি গড়ে তোলে, যেখানে বাহাউদ্দীন দরবেশী তরিকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মাদ্রাসার প্রধান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। বেশ কয়েক বছর পর পিতা ইন্তেকাল করেন এবং রুমি মাত্র বিশোর্ধ বয়সে মাদ্রাসার প্রধান নিয়োজিত হন। গভীর জ্ঞানসম্পন্ন নিষ্ঠাবান ওস্তাদ হিসেবে তিনি ব্যাপক খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর মাদ্রাসায় ছাত্র সংখ্যা ছিল দশ হাজারের বেশি। ব্যাপক অর্থে রুমির তরিকাপন্থীদের কাজ ছিল ব্যক্তিকে উন্মোচন ও যৌথ হৃদয়ের অন্তর্ভূক্ত করা। এই তরিকার সদস্যবা সংগীত ও কবিতা চর্চা করতেন। তারা নীরবে বসতেন, সংলাপ শুনতেন — কাহিনি, হাস্য-পরিহাস, ধ্যান — সবকিছুর চর্চা হতো। তারা উপবাস করতেন এবং ভোজেও মিলিত হতেন। রুমির এই দলে আহিম বা'য নামে একজন পাচক ছিলেন, যিনি তাদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ এক ব্যক্তিত্ব, এখনো কোনিয়ায় তাঁর রওজা মোবারক বিদ্যমান। রুমির তরিকার সদস্যরা একসাথে হাঁটতেন। তারা

উদ্যান ও ফলের বাগানে কাজ করতেন। অত্যন্ত সতর্কতার সাথে তারা কখনও জান্তব আচরণ পালন করতেন, যা ছিল এক ধরনের লিখিত সংকেত।

এটি সংসার ধর্ম পরিত্যাগকারী কোনো সমাজ ছিল না। প্রত্যেকেরই পরিবার ছিল এবং তারা ভিন্ন ভিন্ন পেশায় নিয়োজিত ছিলেন। তাদের মধ্যে ছিল রাজমিস্ত্রী, মুদি দোকানি, তাঁতি, সূত্রধর, টুপি প্রস্তুতকারী, দর্জি, পুস্তক বাঁধাইকারী। তারা সবাই নিজ নিজ কাজে আত্মনিবেদিত ছিলেন। এসব কাজ ছিল ভাবাচ্ছন্নতার ইতিবাচক দিক। অনেকে তাদের বলতেন সূফি। আমি বলতে চাই যে, তারা হৃদয়ের পথে জীবনযাপন করতেন।

বাহাউদ্দীনের মৃত্যুর কয়েক বছর পর ১২৩১ সালে কোনিয়ার উত্তর-পূর্ব দিকে বেশ দূরের এক পার্বত্য অঞ্চল থেকে বুরহান মাহাক্কিক নামে একজন দরবেশ ফিরে এসে জানতে পারেন যে, তাঁর ওস্তাদ, অর্থ্যাৎ রুমির পিতা বাহাউদ্দীন ইন্তেকাল করেছেন। তিনি সিদ্ধান্ত নেন যে, অবশিষ্ট জীবন তিনি তাঁর ওস্তাদের পুত্রকে দীক্ষা দেওয়ার কাজে নিবেদিত থাকবেন। পরবর্তী নয় বছর পর্যন্ত তিনি রুমিকে অনেক সময় একাদিক্রমে তিনটি চল্লিশ দিবস (চিল্লা) উপবাসব্রত পালনের দীক্ষা দেন। রুমি এই সূফি ঐতিহ্যের মাঝে আনন্দের উৎসের সন্ধান পান।

রুমির বড় ছেলে সুলতান ওয়ালাদ তাঁর পিতার ১৪৭টি ব্যক্তিগত চিঠি এত বিস্ময়করভাবে সংরক্ষণ করেছিলেন, যার মাঝে প্রায় আটশ বছর আগে রুমির প্রাত্যহিক জীবনের অনেকটাই যথার্থ চিত্র পাওয়া যায়। তিনি সংঘবদ্ধ জীবনে গভীরভাবে জড়িত ছিলেন। একটি চিঠিতে উল্লেখ রয়েছে, এক ব্যক্তিকে তিনি পনেরো দিন ধরে অনুনয় করেছেন তাঁর নিকট থেকে আপর এক ব্যক্তি যে অর্থ ধার নিয়েছিলেন তা আদায় করতে সহায়তা করার জন্য। আরেকটি চিঠিতে তিনি এক বিত্তবান অভিজাতকে অনুরোধ জানিয়েছেন একজন ছাত্রকে সামান্য পরিমাণে অর্থ ধার দিতে। একজনের আত্মীয়রা এক বৃদ্ধা ধার্মিক মহিলার কুড়েঘরে গিয়ে ওঠেন এবং রুমি চেষ্টা করেন উদ্ভূত পরিস্থিতি সামলাতে। চিঠিগুলোতে বাস্তব জাগতিক কাজের মধ্যেও কবিতার লাইন ওঠে এসেছে বিক্ষিপ্তভাবে। তাঁর জীবন ছিল আবশ্যকীয় দৈনন্দিন কর্মকাণ্ড কেন্দ্রিক এবং একই সাথে ভাবাবেশে আচ্ছন্ন।

১২৪৪ সালের শীত মৌসুমের ঠিক আগে রুমির সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় অবতার তূল্য উন্মত্ত ধরনের ক্রুদ্ধ ব্যক্তি তাবরিজের শামস-এর সঙ্গে। তিনি তাঁর সমপর্যায়ের একজন নিবিড় বন্ধুর সন্ধানে নিকট-প্রাচ্য চষে বেড়িয়েছেন। অনেক সময় শামস তিন দিন বা চারদিনের জন্য হারিয়ে যেতেন অতিন্দ্রীয় সচেতনতার মাঝে। কঠোর পরিশ্রমের কাজ করার মাধ্যমে তাঁর কল্পনাপ্রবণ বিহ্বলতার ভারসাম্য আনতে তিনি রাজমিস্ত্রীর কাজ নেন। তাঁকে যখন তাঁর মজুরি পরিশোধ করা হতো, তিনি স্থান ত্যাগ করার আগেই সেই অর্থ গোপনে অপর কোনো শ্রমিকের পকেটে ঢুকিয়ে দিতেন। তিনি কোথাও দীর্ঘদিন অবস্থান করতেন না। যখনই ছাত্ররা তাঁকে ঘিরে ধরত, যা তারা অনিবার্যভাবে করত, তিনি পানি পান করার অজুহাত দিয়ে তাঁর কালো রঙয়ের আলখিল্লা জড়িয়ে সেখান থেকে কেটে পড়তেন। তাঁর অবিশ্রাম অনুসন্ধানের কারণে তিনি পরিচিত হয়েছিলেন 'পরিন্দা' (পাখি) নামে। তিনি প্রার্থনা করতেন যে, আল্লাহ তাঁর যে বন্ধুকে আড়াল করে রেখেছেন তিনি অবশ্যই আবির্ভূত হবেন এবং ঐশ্বরিক প্রেমের রহস্য সম্পর্কে তিনি আরও অধিক জানতে পারবেন। তাঁর অন্তর থেকে একটি কণ্ঠ ভেসে আসেঃ "বিনিময়ে তুমি কী দেবে?"

"আমার মাথা," শামস উত্তর দেন।

"তুমি যাঁকে খুঁজছো, তিনি কোনিয়ার বাহাউদ্দীনের পুত্র জালালুদ্দীন।"

১২৪৪ সালের ২৯ নভেম্বর শামস কোনিয়ায় পৌঁছেন এবং একজন সফল চিনি ব্যবসায়ীর ভান করে চিনি ব্যবসায়ীদের এক সরাইখানায় আশ্রয় নেন। কিন্তু তাঁর কক্ষে ছিল শুধু একটি মাটির ভাঙা পানির পাত্র, একটি ছিন্ন মাদুর, মাথা স্থাপনের জন্য এবড়োখেবড়ো একটি মাটির পিণ্ড। একদিন শামস সরাইখানার ফটকে বসে ছিলেন, এসময় ছাত্র পরিবৃত অবস্থায় গাধার পিঠে বসে সেখানে আসেন রুমি। শামস ওঠে দাঁড়ান এবং গাধার তাঁর রশি হাতে নেন।

"নিগূঢ় তাৎপর্য সম্পন্ন চালু মুদ্রা পরিবর্তনকারী, প্রভুর নামসমূহ জপকারী, আমাকে বলো, কে সেরা, মুহাম্মদ অথবা বেস্তামি?'

"দরবেশ ও রাসূলদের মধ্যে মুহাম্মদ অতুলনীয়।"

"তা হলে কীভাবে একথা বলা হয়েছে, 'আপনাকে জানা উচিত, কিন্তু আমরা আপনাকে জানতে পারিনি,' আর বেস্তামি বলেছেন, "আমার ঐশ্বর্য কত মহান!"

প্রশ্নের গভীরতা উপলব্ধি করে রুমি জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। যখন তাঁর জ্ঞান ফিরল, তিনি উত্তর দিলেন, "মুহাম্মদের ক্ষেত্রে রহস্য সবসময় উদঘাটিত ছিল, কিন্তু বেস্তামি এক গ্রাস গ্রহণ করেই সন্তুষ্ট ছিলেন।"

উভয়ে স্খলিত পায়ে এক সঙ্গে চলে গেলেন এবং 'সোহবত' পরিভাষায় পরিচিত অতিন্দ্রীয় আলোচনায় টানা সপ্তাহের পর সপ্তাহ, এমনকি মাসের পর মাস কাটিয়ে দিলেন।

তাদের সাক্ষাৎ সম্পর্কিত আরেকটি বিবরণ পাওয়া যায়, তা হলো, একদিন রুমি কোনিয়ার এক ফোয়ারার ছোট এক চত্তরে ছাত্রদের পাঠ দান করছিলেন। ফোয়ারার পাশে খোলা অবস্থায় কিছু বই ছিল। শামস দ্রুত পায়ে ছাত্রদের মাঝখান দিয়ে এসে বইগুলো ঠেলে পানিতে ফেলে দিলেন।

"আপনি কে এবং এসব কী করছেন?" রুমি প্রশ্ন করেন।

"তুমি যা কিছু পাঠ করছিলে এখন তোমাকে সেসবের মাঝে কাটাতে হবে।"

রুমি ফোয়ারার মধ্যে বইগুলোর দিকে তাকালেন, যার মধ্যে একটি ছিল তাঁর পিতার মূল্যবান দিনপঞ্জী, 'মা'রিফ।'।

শামস বললেন, "আমরা এগুলো তুলে নিতে পারি। বইগুলো সবসময় যেমন শুকনো ছিল তেমন শুকনোই থাকবে।" রুমিকে দেখানোর জন্য তিনি পানি থেকে 'মা'রিফ তুললেন। সেটি সম্পূর্ণ শুকনো।

"ওগুলো ওখানেই থাকুক," রুমি বললেন।

বইগুলো এবং ধার করা সচেতনতা পরিত্যাগের মধ্য দিয়ে রুমির প্রকৃত জীবন এবং তাঁর প্রকৃত কবিতার সূচনা ঘটল। "রুমি বলেছেন, "আমি আল্লাহ সম্পর্কে আগে যা ভেবেছি, আজ একজন মানুষের মধ্যে তাঁর সাক্ষাৎ পেলাম।"

শামসের সঙ্গে সাক্ষাৎ রুমির জীবনের কেন্দ্রীয় ঘটনা ছিল। তাঁরা প্রায় সাড়ে তিন বছর একসঙ্গে কোনিয়ায় ছিলেন। এ সময়ের মধ্যে রুমির ছাত্রদের ঈর্ষার কারণে শামসকে দু'বার বিতাড়িত হতে হয় এবং দু'বারই রুমি তাঁর ছেলে সুলতান ওয়ালাদকে পাঠান তাঁকে ফিরিয়ে আনতে। পরবর্তীতে কী ঘটেছে সে সম্পর্কে বিদ্বজনদের মধ্যে বিস্তর বিতর্ক রয়েছে। হয় শামস নিজেই চলে যান, কোনো নিশানা ছাড়াই নিরুদ্দেশ হন, অথবা রুমির এক পুত্র আলা-আল-দীনসহ তাঁর কিছু ছাত্র ঈর্ষান্বিত হয়ে তাঁকে

হত্যা করেন। শেষের ব্যাখ্যাটিই সুলতান ওয়ালাদ দ্বারা সূচিত মৌলভি তরিকার দরবেশদের মধ্যে মৌখিকভাবে চলে এসেছে।

এই ব্যাখ্যা অনুসারে শামসের মৃত্যুর পর তিনি স্বপ্নে দেখা দেন সুলতান ওয়ালাদকে এবং তাঁর কাছে তাঁকে হত্যার ঘটনা বর্ণনা করেন। সুলতান ওয়ালাদ এই দুঃখজনক সংবাদ পিতার কাছে প্রকাশ করেননি। তিনি পুত্রকে শামসের সন্ধানে দামেশক এবং অন্যান্য স্থানে পাঠান। এ পরিস্থিতি ইউসূফের কাহিনির বিপরীত এক ধরনের দৃষ্টান্তে পরিণত হয়, যার মধ্যে ইউসূফের ভাইয়েরা তাদের পিতা ইয়াকুবের কাছে ভান করেন যে, সেই প্রিয় একজন মারা গেছেন; একটি নেকড়ে তাঁকে হত্যা করেছে। এখানে রুমিকে বলা হয়নি যে, তাঁর প্রিয় একজনকে তাঁরই ছাত্রেরা হত্যা করেছে, যাদের একজন তাঁর পুত্র। দুটি কাহিনিতেই কেন্দ্রীয় চরিত্র বহু বছর ধরে তাদের প্রিয়তম ব্যক্তি সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা নিয়ে বাস করেছেন। ইউসূফের কাহিনির নিস্পত্তি চমৎকারভাবে ঘটে যখন ইউসূফ তাঁর স্বপ্নের মর্ম ব্যাখ্যা করার দক্ষতা প্রদর্শন করে মিশরের শস্য ভাণ্ডারের দায়িত্বে নিয়োগ লাভ করেন এবং এরপর তাঁর পরিবারের সঙ্গে পুনর্মিলিত হন।

শামস-এর সঙ্গে রুমি পুনর্মিলিত হন কবিতায় এবং অন্তরের গভীরতম স্থানে। সম্ভবত তাবরিজের শামস-এর স্বকীয় উন্মাদনাপূর্ণ বৈশিষ্ট্য একটি সনাতনী ধর্মীয় সম্প্রদায়ের পক্ষে ধারণ করা সম্ভব হতো না, যদি না রুমির মতো একজন তাঁকে নিজের আত্মা ও চেতনার মাঝে ধারণ করতেন, যিনি বুনো স্বভাবের অজ্ঞেয়বাদী অভিজ্ঞতা এবং অধিকতর ঐতিহ্যগত বিশ্বাসের মধ্যে সেতুবন্ধন হতে পারেন। এই রহস্যজনক ঘটনা সামনে আসে শামসের সন্ধানে রুমির এক সফরের সময়। হঠাৎ দামেশকের রাস্তায় হাঁটার সময় রুমি অনুভব করেন যে, স্বয়ং তিনিই উভয়ের বন্ধুত্বের স্বরূপ এবং শামসকে অনুসন্ধান করার আর কোনো প্রয়োজন নেই। তাদের একত্রে থাকার মধ্যে যে অলৌকিকত্বই থাকুক না কেন, তিনি এখন তাঁর নিজের মাঝে। তিনি শামসের অনুসন্ধান থামিয়ে দেন।

রুমির কবিতার অনুবাদক এবং তার জীবনী লেখক ফ্র্যাঙ্কলিন লুইস তাঁর ওপর ব্যাপক গবেষণা করেছেন। তিনি মনে করেন যে, শামসকে হত্যা করা হয়নি। বরং তিনি স্বেচ্ছায় কোনিয়া ছেড়ে চলে যান, সম্ভবত এ কারণে রুমির আত্মার বিকাশ আরেকটি পর্যায় পর্যন্ত বিকশিত হোক। এটা সত্য

যে, শামস একজন অতিন্দ্রীয়বাদী ছিলেন এবং গতিশীলতাই ছিল তাঁর জীবন এবং সবসময় তা অধিক; যা কিছু আসুক, সবসময় অধিক আশির্বাদ হিসেবে বর্ধিত হোক, ভাবাচ্ছন্নতার আরও প্রশংসা ছড়িয়ে পড়ুক। শামসের ক্ষেত্রে এটি কঠোর চাপের কাজ ছিল, যা অন্যের ক্ষেত্রে প্রায় অসম্ভব। শামস একবার বলেছিলেন যে, তুমি যদি কাবাকে তুলতে পারো এবং সেখান থেকে পৃথিবীর বাইরে বের করে আনতে পারো, তখন তুমি দেখতে পাবে আমরা সবাই কী ইবাদাত করছিলাম — দিনে পাঁচবার ইবাদাতের অনন্ত ঐশ্বর্য দেখা যেত পরস্পরের মাঝে। প্রচলিত ধর্মতত্ত্বে এই দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করা কঠিন। রুমির তরিকার একটি অংশের মধ্যে এটি অবশ্যই গ্রহণযোগ্য হতো না যে, তাদের প্রিয় ওস্তাদ এমন একজন বুনো মানুষের সাহচর্যে পুরোপুরি মগ্ন হয়েছেন। এ প্রেক্ষিতেই ফ্র্যাঙ্কলিন লুইস মনে করেন যে, শামস স্বেচ্ছায় নিরুদ্দেশ হয়েছিলেন। এবং তাঁর রওজা মোবারক অন্য কোথাও আছে, কোনিয়ায় নয়; হয়তো তাবরিজের পথে 'খুয়ে' নামে এক নগরীতে। সেখানে তাঁর নামে একটি মিনার আছে। কিন্তু কোনোটাই নির্দিষ্ট নয়। শামস অধরাই রয়ে গেছেন।

প্রফেসর কোলম্যান বার্কস তার গবেষণায় ব্যবহৃত তথ্যের ভিত্তিতে বিশ্বাস করেন যে, শামস পৃকতপক্ষে ঈর্ষাজনিত কারণে হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন। একটি বিষয় নিশ্চিত যে, শামসের নিখোঁজ হওয়া, তা সহিংসতার কারণেই হোক, অথবা তাঁর নিজের ইচ্ছায় হোক, এই দুঃখজনক ঘটনার পর শামসের কবিতার মর্ম গভীরতর হয়েছে। আকাঙ্ক্ষার মূল আরো উজ্জ্বল ও আরো মূখ্য হয়ে ওঠে এবং শামস ও রুমির মহিমান্বিত বন্ধুত্বের মাঝে যে গভীরতা তা প্রতিফলিত হয় রুমির কবিতায়।

রুমির দুজন স্ত্রী ছিলেন। প্রথম জন গওহর খাতুন, যাঁর গর্ভজাত সন্তান আলা আল-দীন এবং সুলতান ওয়ালাদ। গওহর খাতুন ১২৪২ সালে ইন্তেকাল করেন। এরপর রুমি বিয়ে করেন কিরা খাতুনকে, যাঁর গর্ভজাত পুত্রসন্তান ছিলেন মুজাফফর এবং একজন কন্যাসন্তান ছিলেন মালিকা। কিরা খাতুন সম্পর্কে একটি চমকপ্রদ কাহিনি আছে। রুমি এবং শামস যে কক্ষে উপবিষ্ট হয়ে আলোচনায় লিপ্ত ছিলেন, একদিন কিরা খাতুন সেই কক্ষের দরজার ছিদ্র দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখতে পান যে, কক্ষের একটি দেয়াল সম্পূর্ণ উন্মুক্ত এবং ছয় জন মহিমান্বিত ব্যক্তি সেখানে প্রবেশ করলেন। অচেনা লোকগুলো কুর্ণিশ করে রুমির পায়ে ফুল স্থাপন করলেন। তখন শীতের

মাঝামাঝি। তারা ফজর নামাজের সময় পর্যন্ত ছিলেন। শামসের দিকে তারা ইশারা করেন নামাজে ইমামতি করার জন্য। তিনি কোনো অজুহাত দিলেন এবং রুমি ইমামতির দায়িত্ব পালন করলেন। নামাজ আদায় শেষ হলে ছয় জন লোক দেয়াল ভেদ করে চলে গেলেন। রুমি কক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে সংলগ্ন কক্ষে স্ত্রীকে দেখে ফুলগুলো তার হাতে দিয়ে বললেন, "কিছু দর্শনার্থী ফুলগুলো তোমার জন্য এনেছে।"

পরদিন কিরা খাতুন ফুলের তোড়া থেকে কয়েকটি পাতা ও ফুল তার ভৃত্যের হাতে দিয়ে তাকে পাঠালেন সুগন্ধির বাজারে। সুগন্ধি বিক্রেতারা হতবুদ্ধি হয়ে গেল, তারা ফুলগুলো শণাক্ত করতে পারলেন না। শেষ পর্যন্ত একজন হিন্দুস্থানি মশলা ব্যবসায়ী ফুলগুলো চিনতে পরলেন যে, এই ফুল কেবল সিংহলে (শ্রীলঙ্কা) জন্মায়। এই অদ্ভুত খবর নিয়ে ভৃত্য বাড়ি ফিরে এসে যখন ঘটনাটি বলছিল, ঠিক তখনই রুমি উপস্থিত হয়ে কিরা বেগমকে বললেন ফুলগুলোকে যত্ন সহকারে রাখতে। কারণ হিন্দুস্থানি দরবেশরা বেহেশত থেকে এ ফুল এনেছেন, মানুষ যে ফুল হারিয়ে ফেলেছিল। কিরা খাতুন যতদিন জীবিত ছিলেন (রুমির ইন্তেকালের উনিশ বছর পর তিনি ইন্তেকাল করেন), ততদিন ফুলগুলো তাজা ও সুগন্ধযুক্ত ছিল। এ ফুল চোখের কোনো অসুখে বা কোনো ক্ষতে ব্যবহার করা হলে তাৎক্ষণিক নিরাময় লাভ হতো।

আবেশে ঘূর্ণনকারী প্রথম দরবেশ হিসেবে জালালুদ্দীন রুমির নাম অবশ্যই জনপ্রিয় হয়ে ওঠেছিল। ধারণা করা হয় যে, দৈহিক ও শ্রবণ সংক্রান্ত ধ্যানের ('সেমা' অথবা 'সামা') এই প্রক্রিয়ায় রুড়মিকে শিক্ষা দিয়েছিলেন তাবরিজের শামস। কোনো ব্যক্তি যদি কোনো কিছু অর্জনের চেষ্টা করে, তাহলে 'সামা'য় উপস্থিত হয়ে উচ্চারিত শব্দগুলো গভীর অভিনিবেশ সহকারে শ্রবণ এবং ঘূর্ণায়মান নৃত্য দর্শনের মাধ্যমে তা সম্ভব। সৃষ্টিকর্তার করে তার সৃষ্টি মানুষের প্রত্যক্ষ যোগসূত্র স্থাপনের উপায়ও 'সামা'। রুমি অনেক সময় তাঁর ঘূর্ণনের মাঝেই কবিতা রচনা করতেন। তিনি সুর ও কবিতা এবং গতিকে আত্মায় একত্রিত করতেন, যা ছিল তাঁর আত্মার কাজকে বিকশিত করার জন্য। তিনি তাঁর এক সংলাপে বলেছেন :

"প্রথম খলিফা আবুবকরের প্রার্থনায় সাড়া দিয়ে আল্লাহ রোমানদেরকে তাঁর ক্ষমাশীলতার অন্যতম প্রধান প্রাপক এবং রোমান আনাতোলিয়াকে

সকল ভূখণ্ডের মধ্যে সুন্দরতম হিসেবে উপহার দিয়েছেন। এই স্থানের লোকজন যেহেতু এমন মহিমা গ্রহণ করতে পারেনি, তারা অন্তর্নিহিত জীবন অথবা অদৃশ্য জগতের স্বাদ সামান্যই পেয়েছে। সেজন্য আমি খোরাসানের (পারস্য) আকর্ষণ থেকে দূরে চলে গেছি, যাতে আমার তরিকার সন্তানেরা রোমান তাম্রকে রূপান্তরিত করতে পারে সুবর্ণে। এই আলকেমির কারণে তারা নিজেদের দার্শনিক প্রস্তরে পরিণত করবে। কিন্তু আমি যে উপঢৌকন প্রদান করেছি, রোমান আনাতোলিয়া যেহেতু তা গ্রহণের জন্য প্রস্তুত ছিল না, সেজন্য সেখানকার বাসিন্দাদের আধ্যাত্মিক পথে প্রবেশ করানোর জন্য উদ্ভাবন করেছি সুর সহযোগে কবিতার আবৃত্তির। এই অঞ্চলের মানুষ অত্যন্ত অনুগ্রহ ধন্য, প্রাণপ্রাচুর্যে পরিপূর্ণ, কৌতুহলী, এবং শিল্পপ্রিয়। কিন্তু একটি অসুস্থ শিশুকে ওষুধ খাওয়াতে অবশ্যই তাকে যেমন মিষ্টি দ্বারা তুষ্ট করতে হয়; অনুরূপ তাদেরকে কবিতার দিকে টানতে হবে আত্মার প্রতি আকাঙ্ক্ষা অর্জনের জন্য।"

জীবনী সংক্রান্ত উৎসগুলো থেকে আমাদের কাছে অনেক কাহিনি ওঠে এসেছে; রুমি এবং শিশুদের নিয়ে, রুমি এবং ভিক্ষুক, সমাজ কর্তৃক পরিত্যক্ত এবং বিশেষ করে রুমি এবং জীবজন্তু সম্পর্কিত কাহিনি। জান্তব মন নিয়ে তিনি বলেছেন এবং তিনি জন্তুর ব্যাপারে অত্যন্ত স্পর্শকাতর ছিলেন। প্রতিবছর রুমি কোনিয়ার কাছে এক জায়গায় যেতেন, যেখানে উষ্ণ ঝরনা ছিল। বড় একটি হ্রদের পাশে আয়োজিত হতো সংগীত উৎসব এবং রুমি তাঁর সংলাপ উপস্থাপন করতেন। একদিন হ্রদে ভেসে বেড়ানো হাঁসগুলো এত চিৎকার করে ডাকাডাকি করেছিল যে, সমবেত লোকজন রুমির কথা শুনতে পারছিল না। রুমি হাঁসগুলোর উদ্দেশে চিৎকার করলেন, "হয় তোমরা কথা বলো, আর তা না হলে আমাকে বলতে দাও।" সম্পূর্ণ নীরবতা নেমে এলো এবং সেখানে তাঁর অবস্থানের অবশিষ্ট সপ্তাহগুলোতে কোনো হাঁস আর কোলাহল করেনি। যখন তাঁর কোনিয়ায় ফিরে যাওয়ার সময় হলো, তিনি হ্রদের কিনারায় গিয়ে হাঁসগুলোকে অনুমতি দিলেন তাদের যত খুশি কোলাহল করতে ইচ্ছা হয়, তারা তা করতে পারে। এরপর আবারও হাঁসের ডাকাডাকি শুরু হয়।